Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.31-36
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন': নিম্নবর্গের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই

ড. রিন্টু দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract

A subaltern is someone with a low ranking in a social, political or other hierarchy. It can also mean someone who has been marginalized or oppressed. The topic of our discussion is to focus on the self-establishment of subalterns in the novel named 'Neel Mayurer Jouban' by Selina Hossain. The main theme of this novel is to establish the regional language of the poets of Charyapada era. The writer has depicted the history of language movement and freedom of Bangladesh. The hero Kanhupada's poetic creativity itself became the enemy of him. Besides, the oral language and social status of the subalterns turned into the reason of their sorrow. The writer has recreated the time of 'Charyapada' in this novel. The consciousness of language and nationalism of Kanhu made a protest against the emperor which was spreaded among the hopeless people of the society. This protest was not only the establishment of the dignity of language but it also became the struggle of self-establishment of subaltern people. Our main focus of this research article is to highlight this aspect in 'Neel Mayurer Jouban' by Selina Hossain.

Key words: Subaltern, Self-establishment, Protest, Struggle, Language-movement.

'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮২) সেলিনা হোসেনের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর চর্যাপদের যুগের কবিদের আঞ্চলিক ভাষার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ঔপন্যাসিক চর্যাপদের সময়য়ের রূপকে ধরার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটি ১১টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে ভুসুকুপাদ রচিত ৬ সংখ্যক চর্যার 'কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছুহ কীস' পদটির তৃতীয় চরণ 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী' প্রবাদের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। এই পদটির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক চর্যাপদের কবিসমাজের সামাজিক অবস্থানকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। হরিণের নিজের মাংস যেমন তার নিজেরই শত্রুতা বা দুঃখের কারণ, তেমনি কাহ্নুপাদের লেখনী ও কবিত্বশক্তি তাকে উচ্চবর্ণের শত্রু হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে নিম্নবর্গের মানুষের মুখের ভাষা, সামাজিক অবস্থান তাদের দুঃখের মূল কারণ হয়ে উঠেছে। অস্পৃশ্য হলেও তাদের সমাজে নারীরা ক্ষমতাশীল উচ্চবর্গের পুরুষদের লালসার শিকার হয়। এখানে তাদের শরীর তাদেরই 'বৈরী' বা শত্রু হয়ে দেখা দিয়েছে।

ক্ষমতালোভী ও স্বার্থপর ব্রাহ্মণসমাজ সমাজের নিচুতলার মানুষদের চিরকাল অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে। তাই চর্যার কবিসমাজের কবিত্বগুণ তাঁদের কাছে চরম বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজতন্ত্রের আড়ালে ব্রাহ্মণসমাজ নিম্নবর্গের মানুষদের উপর নানা বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেয়। পদ রচনার অপরাধে কাহ্নুপাদকে ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। হাত দুটি হারিয়ে তাকে ব্রাহ্মণসমাজ ঘোষিত অপরাধের চরম মূল্য দিতে হয়। কোনো জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাকে যে এভাবে দমন-পীড়নের

মাধ্যমে ঠেকিয়ে রাখা যায় না ইতিহাস তার সাক্ষী আছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উচ্চবর্গের অত্যাচার সহ্য করতে করতে একসময় কাহ্নুপাদের মধ্যেও প্রতিবাদের আগুন জ্বলে উঠেছে। সেই আগুন ক্রমশ সমগ্র সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে মুক্তিকামী বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের তৎকালীন অগ্নিময় চিত্রকে সেলিনা হোসেন দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর চর্যাপদের পটভূমিতে উপস্থাপন করে কাহ্নুপাদের ভাষার জন্য লড়াই ও স্বাজাত্যবোধের সমান্তরাল করে দেখাতে চেয়েছেন। লেখিকার নিজের কথাতেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

> "'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের পটভূমি দশম-দ্বাদশ শতকের বাংলাদেশ। উপন্যাসের নায়ক কাহ্নুপাদের নিজ ভাষার জন্য লড়াই আমাদের বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের প্যারালাল। রাজার অত্যাচারে পালিয়ে গিয়ে গ্রামবাসী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিয়ে চামড়া পোড়ার গন্ধ বুকে টেনে নেয়। তখন নিজেদের ভূখণ্ড হবে এমন স্বপ্ন দেখে তারা। সেই স্বপ্নে বাংলাদেশের সীমানা বর্ণনা করি। অর্থাৎ তা হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্যারালাল।" [১]

চর্যাপদের কালকে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে পুনর্নির্মাণ করেছেন। চর্যাপদের বৌদ্ধ সহজিয়া ও গুহ্য সাধনপদ্ধতি নয়, লেখিকা গুরত্ব দিয়েছেন তৎকালীন সমাজকে। একদিকে উচ্চবর্গের সামাজিক অনুশাসন অন্যদিকে সমাজের প্রান্তিক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নিজস্ব ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামী চেতনাকে যুগপৎ এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। ভোগবাদী ভাবনায় বিশ্বাসী রাজতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র একে অপরের হাত ধরে চলত। রাজা বুদ্ধমিত্র ক্ষমতার শীর্ষে থাকলেও রাজ্যশাসন বিষয়ে তিনি মন্ত্রী দেবল ভদ্রের উপরই নির্ভর করতেন। রাজার এই অন্ধবিশ্বাস ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মন্ত্রী দেবল ভদ্র ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন। দেবল ভদ্রের তৈরি নিয়মে ব্রাহ্মণরাই সমস্ত সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়। বহু নিষ্কর জমি তারা ভোগদখলের সুযোগ পায়। অন্যদিকে রাজার অগোচরে নিম্নবর্গের মানুষদের জমি জবরদখল করে নেওয়া হয়। ব্রাহ্মণদের এই শোষণ ও অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পায় না তারা। কিন্তু কাহ্নুপাদ এই অত্যাচারকে সহজে মেনে নিতে পারে না। তার বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে কবিতায়,

> "আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্দেলা।
> তা দেখি কাহ্নু বিমনা ভইলা।।" [২]

রাজার অনুমতি পেলেও রাজসভায় কাহ্নুর কবিতা পাঠের সুযোগ হয় না। রাজসভার এক নিম্নশ্রেণির কর্মী হিসেবেই কাহ্নুর পরিচিতি। মন্ত্রী দেবল ভদ্রের কাছে কাহ্নুর কবিতাচর্চা আস্পর্ধার সামিল। রাজ্যের শাসনকার্য ও অনুশাসন সবকিছু যে দেবল ভদ্রের হাতে তা তার কথাতেই স্পষ্ট,

> "রাজা কে? এই দেবল ভদ্র সব। এখানে রাজার অনুমতিতেও কোন কাজ হয় না। ভাগ, যতসব ছোটলোকের কারবার। লাই দিলে মাথায় ওঠে।" [৩]

তৎকালীন শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও তার নিদারুণ পরিণামের চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন সেলিনা হোসেন।

রাজতন্ত্রের অন্যায় শাসন শুধু নয়, সমাজে নিম্নবর্গের মানুষের ওপর উচ্চবর্গের নিষ্পেষণ ও নিষ্ঠুরতা দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে। কাহ্নু-শবরী, দেশাখ-বিশাখা, ভুসুকু-সুলেখা, সুদাম, লোকী, গুণী, ছুটকী, ডোম্বী প্রমুখ নিম্নবর্গের মানুষের ওপরও রাজা ও ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবল ভদ্রের অপশাসন এবং নির্মম অত্যাচারের চিত্রকে লেখিকা তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বকেয়া করের জন্য বা অন্য কোনো সামান্য অপরাধে নিম্নবর্গের এই মানুষদের অকথ্য অত্যাচার ও শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। কখনো চুনের ঘরে দিনের পর দিন বন্দি করা, চর্মপাদুকা প্রহার করা প্রভৃতি দশ রকমের শাস্তি তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। নিম্নবর্গের মানুষেরা উচ্চবর্গের কাছে অস্পৃশ্য হলেও নিম্নবর্গীয় নারীরা এই তথাকথিত অভিজাত অত্যাচারী পুরুষদের

লালসার শিকার হয়। শবরী, ডোম্বী, দেবকী, বিশাখা, সুলেখা —এরা প্রত্যেকেই যেন 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরি'। রক্ষক যখন ভক্ষকে পরিণত হয় তখন নিজের অপরাধকে আড়াল করার জন্য নিয়মও তৈরি করে নিজের পক্ষেই। দেবল ভদ্রের তৈরি করা আইনও রক্ষকের অপকর্মকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করেছে,

> "ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে কোনো ধরণের মেলামেশা করতে পারবে, সে যদি তার বিবাহিত স্ত্রী নাও হয় তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এমনকি তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলেও সংসর্গদোষ ছাড়া অন্য কোনো নৈতিক অপরাধ হবে না।" [৪]

নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে সংসর্গদোষের ফলে সন্তান উৎপাদন করার ছাড়পত্র রয়েছে, কিন্তু নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোককে বিয়ে করাটা 'অমার্জনীয় অপরাধ' হিসেবে গণ্য হয়। দেবল ভদ্রের মতো নিষ্ঠুর মানুষের কাছে এই নিম্নবর্গের মানুষেরা নিছক কীট মাত্র। সমাজের প্রতি এই পাশবিক আইনের বিরুদ্ধে সুধাকর পণ্ডিত সোচ্চার প্রতিবাদ জানালে মন্ত্রী দেবল ভদ্র অট্টহাসি হেসে বলেছিলেন,

> "সমাজ ? সমাজ তো আমরাই। যাদের হাতে আইন তৈরি করবার ক্ষমতা আছে তারাই এ সমাজ। আমরা ভোগ করবো, ওড়াবো, তছনছ করবো, যা খুশি তা করবো, বাকি সব কীটানুকীট।" [৫]

সাধারণ প্রজাকে 'কীটানুকীট' মনে করে যে রাজা ও তার পারিষদ, নারীর প্রতি প্রবল অসম্মান প্রদর্শন করে যে আইন, সাধারণের মুখের ভাষাকে মর্যাদা দেয় না যে রাজদরবার সেই রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সেই তথাকথিত অভিজাত ও উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিবাদ জানিয়েছে কাহ্নু ও তার সমাজ।

এই উপন্যাসের অন্তর্বয়নে নানা ঘাতপ্রতিঘাত ও জটিলতা থাকলেও বাইরে নদীমাতৃক শস্যশ্যামল বাংলাদেশের চিত্র ফুটে উঠেছে। অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও অন্যান্য জীবিকার মানুষও দুর্লক্ষ্য নয়। চাঙারি বোনা, শিকার করা, কার্পাস বোনা, দুধ দোয়া, খেয়া পারাপার প্রভৃতি পেশার মানুষের মধ্যে বাঙালির জীবনযাপনের চিত্রকে আমরা দেখতে পাই। কাহ্নু ও শবরীর সংসার-জীবনেও বাঙালির দৈনন্দিন ঘরকন্নার ছবি ধরা পড়েছে। কাগনি ধানের ভাত, মৌরলা মাছের ঝোল, হরিণের মাংস, শুক্তো, চিংড়ি দিয়ে সাদা ডাঁটার চচ্চড়ি প্রভৃতি আমাদের পরিচিত খাদ্যাভ্যাসের ছবি। রাজতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের করাল ভ্রূকুটি সত্ত্বেও এরা পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

সমাজ-বিবর্তনের ধারায় মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নানা জটিল আবর্তের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। নরনারীর পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা ও দাম্পত্যজীবনও সমাজের বিবর্তনে নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে নারীপুরুষের সম্পর্কের অসঙ্গতিগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঔপন্যাসিক। এই উপন্যাসে নারীপুরুষের সম্পর্ক অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাহ্নু ও শবরীর দাম্পত্য প্রেম প্রকৃতি চেতনার মধ্য দিয়ে একাত্মতা লাভ করেছে। কাহ্নুর চোখে শবরী প্রেম ও শান্তির প্রতীক। শবরীর প্রতি কাহ্নুর মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে,

> "তুমি এক পবিত্র মন্দির শবরী। সারাক্ষণ সেখান থেকে আরতির ঘণ্টা শুনতে পাই। এ একটা চমৎকার প্রার্থনার ভাষা। এর বাইরে আমি আর কোনোকিছু বুঝতে চাই না। বুঝি না ঈশ্বর, বুঝি না বেদ।" [৬]

প্রাকৃতিক পরিবেশ কাহ্নুর কবিমনে এক রোমান্টিকতার আবহ তৈরি করেছে। শবরী তার চোখে শুধুমাত্র একজন নারী নয়, তার জীবন-আকাশের ধ্রুবতারা, তার জীবনবীণার ঝংকার এবং জীবন যাপনের মূল চালিকা শক্তি।

একদিকে শবরীর সৌন্দর্য তাকে নতজানু করে, শবরীর প্রতি ভালোবাসা তাকে ঈশ্বর ও বেদকে ভুলিয়ে দেয় অন্যদিকে তার হৃদয়ের গভীরে এক দহন চলতে থাকে। এই দহনের ফলে সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন মনে হয়। তার কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয় অর্থপূর্ণভাবে বেঁচে থাকা। আর এই অর্থপূর্ণ বেঁচে থাকা তখনই সম্ভব যখন অন্যের প্রভুত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচা যায়। আর তাই তার যন্ত্রনাকাতর হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই তারই কথায়,

> "এই সৌন্দর্য অর্থহীন, যদি না বেঁচে থাকা অর্থবহ করা যায়, যদি না বেঁচে থাকার পরিবেশ নিজের না হয়, যদি না পরিবেশ প্রভুত্বের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়।" [৭]

কাহ্নু শবরীর সঙ্গে ঘর বাঁধলেও বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে বেশি টানে। একদিকে শবরীর সৌন্দর্য তাকে বাঁধতে চাইলেও অর্থবহ বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা তাকে সৌন্দর্য-বিমুখ করে। অন্যদিকে শবরীর ঘরের বাঁধন তাকে বাঁধতে চাইলেও বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে বন্ধনমুক্তির দিকে নিয়ে যায়। আসলে উচ্চবর্গের প্রভুত্ব থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরে এক মুক্তিকামী সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর তাই তার সৌন্দর্যবোধ বাঁধন থেকে মুক্তির পথে, সীমা থেকে অসীমের অভিসারী। শবরীর প্রতি তার বক্তব্যেও সেকথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

> "আমি বুঝি না এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফেলে মানুষ কেন ঘরে যায়। ঘরে আমি আনন্দ পাই না সখি। মনে হয় চারপাশের বেড়াগুলো বাতাসের পথ আটকে দেবার জন্য, অন্ধকারের মোহন আকর্ষণ উপেক্ষা করার জন্য তৈরি।" [৮]

'অন্ধকারের মোহন আকর্ষণ' তার কাছে আরো উপভোগ্য হয়ে ওঠে শবরীর সান্নিধ্যে। শবরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে সে যেন প্রকৃতিকেই জড়িয়ে থাকে। শবরী ও প্রকৃতি তার কাছে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

ভৈরব-ধনশ্রীর দাম্পত্য সম্পর্কও গভীর প্রেম ও পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছিল। সমাজের চোখে ভৈরবী অসতী। কিন্তু সেই মিথ্যা অপবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি ধনশ্রী। সমাজে লিঙ্গ-বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন সেলিনা তাঁর সাহিত্যে নারীর সম্মানের দিকটির যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। এই উপন্যাসে ডোম্বী এক সামান্য পাটনী হলেও কাহ্নুর চোখে সে প্রেমচেতনার প্রতীক ও বিদ্রোহের জ্বলন্ত মশাল হয়ে দেখা দিয়েছে। ঔপন্যাসিক কাহ্নুর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

এই উপন্যাসে চর্যার সমকালকে সামনে রেখে সেলিনা ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ও ইতিহাসকে মর্যাদা দান করেছেন। রাজতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কাছে চরম অপমান এবং নির্যাতন সহ্য করেও কাহ্নুপাদ আঞ্চলিক ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে অবিচল থেকেছে। অভিজাত শ্রেণির অন্যায় অত্যাচার তার মনে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। রাজসভায় কাহ্নু তার কবিতা পাঠের জন্য ব্যাকুল হয়েছে। তার এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিছক আত্মতুষ্টি নয়—ফুটে উঠেছে গভীর জীবনবোধ। মনেপ্রাণে জাতীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে সে অন্তরে লালন করেছে,

> "ও প্রবলভাবে অনুভব করে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের রাশভারি সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি ওর লৌকিক ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এ ভাষাতেই কথা বলে ওর মত শত শত জন।" [৯]

আঞ্চলিক ভাষা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কাহ্নু স্বপ্ন দেখেছে একটা ছোট্ট স্বাধীন রাজ্যের। তার সেই স্বপ্নের রাজ্যে রাজাপ্রজা মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে এক হয়ে দিন কাটাবে। সেখানে উচ্চবর্গের নিপীড়ন থাকবে না। সে মনের সুখে গীত রচনা করতে পারবে। বিদ্রোহী কাহ্নু দেবল ভদ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাজসভায় পাখা টানার কাজ ছেড়ে দিয়েছে। মন্ত্রী তাকে রাজ্যের স্তোত্রবাক্য রচনা করতে নির্দেশ দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এর জন্য তাকে ভয়ানক শাস্তি পেতে হয়েছে। দেবল ভদ্র কাহ্নুকে ফাঁসিগাছে না ঝুলিয়ে গীত লেখার অপরাধে হাত দুটো কেটে নিয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও কাহ্নুর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও

স্বপ্নকে শেষ করতে পারেনি। এক অব্যক্ত যন্ত্রনা ও অসহায়তা নিয়ে ভাষার বেঁচে থাকার অমোঘ সত্যকে সে প্রকাশ করেছে এভাবে,

> "এতোদিনে আমার ভুল ভাঙলো দেশাখ। আমি এখন বুঝতে পারছি যে শুধু রাজদরবারই কোনো ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। ওরা যতোই সংস্কৃতের বড়াই করুক ওটা কারো মুখের ভাষা নয়। বাঁচিয়ে রাখবে কে? আমাদের ভাষা আমাদের মুখে মুখেই বেঁচে থাকবে রে দেশাখ।" [১০]

কাহ্নুর এই জাতীয় চেতনা সাধারণ মানুষের মধ্যে সংহতির বোধ গড়ে তুলেছে। রাজশক্তির প্রবল প্রতাপ ও নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে তারা একত্রিত হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। কাহ্নুপাদের সংগ্রামী মন, ভাষা চেতনা ও জাতীয়তাবোধকে সেলিনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষের চেতানার সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছেন। উপন্যাসের শেষে ঔপন্যাসিক যে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন তা বাংলাদেশকেই চিহ্নিত করে। কাহ্নুপাদ তার কাঙ্ক্ষিত দেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে,

> "একটা ছোট্ট ভূখণ্ড আমাদের দরকার। সে ভূখণ্ডটুকু সবুজ শ্যামল আর পলিমাটি ভরা হলেই হয়। সে ভূখণ্ডে দক্ষিণে থাকবে একটা সুন্দর বিরাট বন আর তার পাশ দিয়ে বয়ে যাবে সাগর।" [১১]

প্রবল প্রতাপ ও পরাক্রমের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই করতে হলে আত্মত্যাগ যেমন দরকার তেমনি দরকার সে লড়াইকে পরিচালনা করার জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। মধ্যরাতে রাজার অতর্কিত আক্রমণে বাড়িঘর সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে সকলের মনোবল ঠিক রাখতে, সকলের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে কাহ্নু। একজন প্রকৃত নেতার মতোই সে বলেছে,

> "তোরা কেউ দুঃখ করিস না দেশাখ। আমাদের তেমন একটা জায়গা একদিন হবে। আমরাই রাজা হবো। রাজা-প্রজা সমান হবে। আমাদের ভাষা রাজদরবারের ভাষা হবে। তেমন দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে দেশাখ।" [১২]

আপন ভাষাকে যোগ্য মর্যাদা দেবার লক্ষ্যে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা শেষপর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্নে পর্যবসিত হয়েছে। এমন এক রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে যেখানে 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। গভীর ভাষা চেতনা ও জাতীয়তাবোধ কাহ্নুর মনে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল তা ক্রমশ সকল বিপন্ন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এ লড়াই শুধু ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই হয়ে থাকেনি— এ লড়াই পৃথিবীর সমস্ত শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত নিম্নবর্গীয় মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে কাহ্নুপাদ আর চর্যাপদের পদকর্তা হয়ে থাকেনি—সে হয়ে উঠেছে বিপন্ন জাতির প্রতিনিধি। 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসটিও বিশেষ কালসীমার গণ্ডি অতিক্রম করে একটি বিশেষ জাতির ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার স্বপ্নকে রূপদানের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সমস্ত ভাষার মানুষের বিপন্নতাকে শাশ্বত করে তুলেছে।

সূত্র নির্দেশ :

১. চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত 'সেলিনা হোসেনের মুখোমুখি', গল্পকথা, 'সেলিনা হোসেন সংখ্যা', রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৮
২. সেলিনা হোসেন : 'নীল ময়ূরের যৌবন', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৯, পৃ. ৫
৩. তদেব : পৃ. ৪৩
৪. তদেব : পৃ. ৫৫
৫. তদেব : পৃ. ৫৫
৬. তদেব : পৃ. ১
৭. তদেব : পৃ. ১
৮. তদেব : পৃ. ৩
৯. তদেব : পৃ. ৩৫
১০. তদেব : পৃ. ১৪২
১১. তদেব : পৃ. ১৪৪
১২. তদেব : পৃ. ১৪৪